Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 139 –151
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রেম ও মনস্তত্ত্ব

রিম্পা মাইতি
এম.ফিল, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : maity.rimpa87@gmail.com

Keyword
প্রেম, সমাজ, মনস্তত্ত্ব, দ্বন্দ্ব, সম্পর্ক, জটিলতা

Abstract
Narayan Gangopadhyay is a poet, novelist, short story writer and literary critic. At one hand he has shown the society in his short stories, also the love and psychological conflicts of the men and women in the society have also come up as well. The author has been able to express what he has gained from his real life experience and feelings in his writings. In his story, nature and love become one. Not only the marital relationship but also the complexity of the relationship, emotional conflicts, doubts, has developed the story of breakup in the literature as well as the atmosphere of the new path has been created with these. He has shown his uniqueness in each short story. His story lacks the exuberance of romance, no familial-social tug of war, but the sharp appeal of the subject matter becomes resonant through his narrative quality. An underlying pity touches the reader's heart with a silent but deep sparkling. The stories are coordinated in the thick weave of word-language-description. The interweaving of emotions, reality, civility with the plot makes the short stories engaging, unique and rich in art, which are palatable to the inquisitive reader. The principal quality of the author is prominent in each of his easy-telling stories, the suffering, degradation, breakdown of values of contemporary society and individual– his short stories reveal the truth like the sharp sword in every subject.

Discussion
বাংলা সাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ঊনিশ শতকে চল্লিশের দশকের উত্তাল সময়ে। কবিগুরুর প্রয়াণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গোটা বিশ্বের টালমাটাল অবস্থা, ইউরোপের নাৎসী বাহিণীর আগ্রাসীনীতি, ভারতবর্ষে 'ভারতছাড়ো আন্দোলনের' ডাক এবং সর্বপরি বাংলা পঞ্চাশের মন্বন্তরে সমগ্র বাংলার সমাজ সাহিত্যে সূচিত হয়েছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সাহিত্যের সীমানা যা পূর্বে ছিল নির্দিষ্ট পরিসরে সীমাবদ্ধ, চল্লিশের দশকে সেই সীমিত পরিসরে দেখা গেল ব্যপ্তি। চল্লিশ দশকের পূর্বে কিছু ঔপন্যাসিকের জীবন দৃষ্টিতে (ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়) কথা সাহিত্যের প্রাণের ধারা বজায় ছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যে জীবনের জটিল গ্রন্থিকে অন্বেষণ, তাঁরা শঙ্করের সামন্ততন্ত্র ও শিল্পতন্ত্রের দ্বান্দিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে শিল্পতন্ত্রের জয় ঘোষনা, বিভূতিভূষণ শাশ্বত জীবন সৌন্দর্যকে সাহিত্যে চিরাস্থায়ী রূপে অঙ্কনে প্রয়াস বাংলা কথা সাহিত্যে নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়েছিল।

তিনি ছিলেন একজন সমাজ সচেতন শিল্পী। শিল্প সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে তিনি পালন করেছেন সামাজিক দায়িত্ব। সামাজিক মানুষ, তাঁর মনস্তত্ত্ব, ভালো – মন্দ, জীবনধারন ও জীবনধারনা বরাবরই ছিল তাঁর কৌতূহলের বিষয়। তার অনেক ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের প্রেম দ্বান্দ্বিকতা – মনস্তাত্ত্বিক আঙ্গিক ফুটে উঠেছে। জীবনের প্রতি অপার কৌতূহল ও দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি শিল্প রচনায় প্রণোদিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন –

> ''বাংলাদেশের মফস্বলে আমি ছিলাম, সত্যিকারের বাঙ্গালীকে দুচোখ ভরে দেখবার সুযোগ আমার ঘটেছে। বাবা গ্রামাঞ্চলে খাজনা আদায় করতে গেছেন, আমি তার সঙ্গে গেছি। দেখেছি, অনেক সময় খাজনা আদায় দূরে থাক, বুভুক্ষ কৃষককে কাছারীতে ডেকে শেষে চাল – দিয়ে বিদায় করতে হয়েছে, দেখেছি, এমন মানুষকে বছরের তিন মাস পর্যন্ত যার খোরাক থাকে – বাকী ন'মাস সে কেমন করে থাকে তা স্বয়ং ভগবানও জানেননা; দেখেছি সাঁওতালদের – বুনো শুয়োরেরও অখাদ্য রাখা ওল সেদ্ধ করে বিনা লবনে খেয়ে যাদের বেচে থাকতে হয়। নিজের চোখে না দেখলে জানতেও পারতাম না – সোনার বাংলার আসল চেহারাটা কী?''[১]

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সহজ, স্বাভাবিক মানসিক বিকারগুলিকে, নরনারীর মানসিক দ্বন্দ্বকে তিনি ফ্রয়েড নির্দেশিত পথে বিশ্লেষণ করেননি। এই কারণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশগুপ্ত কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো মনোসমীক্ষার গহনতলে প্রবেশ করেননি। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন –

> ''চেতন – অবচেতনের চিরন্তন সঙ্ঘাতের অতলান্ত গভীরতায় ব্যক্তি জীবনের আনন্দ বেদনার উৎস সাধনের ফলে শিল্পলোকের এক রহস্য – জগতের দ্বার উদঘাটিত হয়েছে বটে, কিন্তু মার্কসীয় জীবনবোধ এ যুগের দৃষ্টিকেই যে একবারে বদলে দিয়ে গেছে। ...এ যুগের শিল্পেও ব্যক্তিনিষ্ঠ মনস্তত্ত্বর স্থান দখল করেছে এক অভিনব মানসলীলা তার নাম দেওয়া যেতে পারে 'সমাজতাত্ত্বিক মনস্তত্ত্ব'। ...যে সমাজ চৈতন্যে যুগজীবন আন্দোলিত ব্যাক্তিমনের গভীরেও তারই প্রতিফলন.''[২]

তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প আলোচনা করে এই মনস্তাত্ত্বিক লক্ষনের প্রসারন কতটা প্রতিফলিত তা আলোচনায় করা হল।

'কুয়াশা' গল্পে প্রৌঢ় রায়চৌধুরীর সাথে মঞ্জ নামে যুবতী মেয়েটির অবৈধ সম্পর্ক ছিল। পাহাড়ে তারা চলে আসে দাম্পত্য জীবনের মুহূর্ত কাটাবে বলে। কিন্তু সেখানে বত্রিশ নম্বর বাংলোয় রাত কাটাতে গিয়ে মদের নেশায় ভদ্রলোক মনে করেছিলেন মেয়েটি বুঝি তাকে তেমন ভালোবাসে না। ঘটনাচক্রে ভদ্রলোকের পায়ে বন্ধুকের গুলি লেগে যায়। কিন্তু অফসিলিয়ারী হাসপাতালের ডাক্তার অমূল্য দত্ত গুপ্ত তার চিকিৎসা করতে এলে মেয়েটি নিজেকে মি. রায়চৌধুরীর কন্যা হিসাবে পরিচিত করেন। ভদ্রলোক এই কথা শুনে নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলে –

> ''মঞ্জ, সত্যিই আমার ভুল ভাঙল এতদিনে। এই বন্দুকের গুলি আমায় জানিয়ে দিলে এবার আমার প্রায়শ্চিত্তের সময় হয়েছে। এখন থেকে সত্যিই তুমি আমার মেয়ে – তোমার কোন ভালো ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব আমি যৌতুক দেব দশ হাজার টাকা। আমি নিজেকে বদলাব। তোমার জীবনকেও বদলে দেব।''[৩]

কিন্তু মঞ্জ কোন ভালো ছেলেকে বিয়ে করেনি। বরং আর এক হিন্দুস্থানীয় সঙ্গী হয়েছিল। ডাক্তারের চিন্তা কুয়াশা চ্ছন্ন হয়েছিল -

> ''রায় চৌধুরী নিজের মেয়ে বলে ভাবতে শুরু করেছে, তাতে মঞ্জর আত্মসম্মানে কোথায় যে ঘা লেগেছে সেইটেই সে কোনমতে বুঝতে পারল না।''[৪]

'মর্যাদা' গল্পে একটি মুচি সামাজিক ব্যবধান ভুলে গিয়ে একটি কলেজের ছাত্রীকে মনে মনে ভালোবেসে নিলেও আত্মসম্মানে আঘাত দিয়ে যখন তাকে সেই মেয়েটি মুচি বলে ডাক দেয় তখন সেই ভালোবাসা প্রেমের স্তরে উন্নীত হলেও একমুহূর্তে ছন্দপতন ঘটে। আঠারো – উনিশ বছরের একটি মুচি কলেজ হোস্টেলে জুতো সারাতে এসে একটি মেয়েকে মনে মনে ভালোবেসে ফেলে। আস্তে আস্তে মুচিটির মনে প্রেমের উদ্রেক হয়। কম মজুরীতে মেয়েটির জুতো সারিয়ে দিত। মেয়েটি পথ দিয়ে যাবার সময় তাকে ডাক দিয়ে দাড় করিয়ে জুতো পালিশ করে দিত। মেয়েটি পুজোয় সময় পুরী বেড়াতে যাবে শুনে মুচিও ভাড়ার টাকা জোগাড় করতে থাকে, এমনকি তার পোশাকের মধ্যেও ধরা পড়তে থাকে পরিবর্তন। যেদিন মেয়েটি হোস্টেল থেকে তাকে মুচি বলে ডেকেছে, -

> "ও হঠাৎ কেমন চমকে উঠল। একবারের জন্য তাকিয়ে দেখল আমার দিকে। পরক্ষনেই যেন শুনতেই পায়নি, এমনিভাবে মাথা নিচু করে হাতের কাজটা করে যেতে লাগল।"[৫]

সে দিনই তার আত্মসম্মানে ঘা লাগে। অন্যদিন সে নিজে গিয়ে দোতলা থেকে জুতো নিয়ে আসত, সেদিন সে চাকর দিয়ে জুতো নিচে পাঠিয়ে দিতে বলেছে কিন্তু চাকর দিয়ে মেয়েটি জুতো পাঠালেও মুচি জুতো না সারিয়ে দু দিন পর সেই জুতো ফেরত পাঠায়। তারপর একদিন শোনা যায় সে মুচির কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে গেছে। এই গল্পে মুচির মানস যন্ত্রনার দিকটা লক্ষ্যনীয় হয়ে উঠেছে। যে ভালোবাসা এতদিন ধরে সে তিল তিল করে মনে পুষ্ট করে তুলছিল, হঠাৎ একদিনের সম্বোধনে তাতে প্রচন্ড আঘাত আসে।

> "আমি ওকে 'মুচি – মুচি' বলে ডেকেছিলাম তাই? ও কি আমার কাছ থেকে আরও কিছু বেশি আশা করেছিল? ও কি ভেবেছিল, ওর মধ্যে থেকে আমি আরো কোনো বড় পরিচয়কে আবিষ্কার করব?"[৬]

এক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবধান মুচির অন্তরের আকর্ষনকে প্রতিহত করতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু যাকে সে মনে মনে ভালোবেসেছিল তার কাছ থেকে এই সম্বোধন সে আসা করেনি।

'তাস' গল্পে দেখা যায় দাম্পত্যজীবনে একনিষ্ঠতার অভাব। এখানে দুই ভাইবোন, ডাক্তার অমূল্য এবং নমিতার তাস খেলায় ব্যপক উৎসাহ এবং তারা পারদর্শীও বটে। তবে এদের সাথে যারা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে, তারা ভিন্ন প্রকৃতির। বি এস সি পাশ করেও অমূল্যের স্ত্রী রেখা তাস খেলতে ভয় পায়। অন্যদিকে দর্শনের অধ্যাপক অসিত স্ত্রীর (নমিতা) কাছ থেকে প্রায় তিরস্কৃত হয়। গ্রীষ্মের ছুটিতে অমূল্যের নিমন্ত্রনে নমিতারা দার্জিলিং যায়। শালবন ঘেরা জায়গাটি অসিতের দারুণ পচ্ছন্দ হয়। এক দুপুরে অমূল্যের নতুন প্রেসক্রিপশন তার সুখভঙ্গ করে –

> "আরে এসব জায়গায় দুপুরে ঘুমালে শরীর খারাপ করে, গা ভারি হয়ে যায়। তার চাইতে এসো এক বাজি তাস খেলা যাক।"[৭]

এরপর ডিসপেন্সারির কাজ ব্যতীত সারাক্ষন চলে অমূল্যের তাস খেলা। তাসের যন্ত্রনায় অসিত কলকাতা ফিরতে চায়। তাই দার্জিলিং এর স্নিগ্ধ প্রকৃতি অধ্যাপকের কাছে কোন সুখকর বার্তা বহন করে আনে না। এই সংকটে তার সঙ্গী হয় রেখা। সমব্যাথীকে পেয়ে অসিতের মনে জেগে ওঠে প্রতিশোধস্পৃহা, দুই- ভাই বোনকে খেলায় হারানোর জন্য সে বিশেষ কৌশল উদ্ভাবন করে এবং এ কাজে সে রেখাকে সহযোগী রূপে নির্বাচন করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে অসিত রেখার দাপটে নমিতারা অস্বস্তিতে ভুগতে থাকে। এমনকি নিষিদ্ধ চুরির আনন্দে রোমাঞ্চিত হয় নতুন জুটি। খেলা শেষে অসিতরা জয় লাভ করে।

বাহান্ন তাসের মধ্যে যে এত আনন্দ ছিল, তা অসিতের অজানা ছিল। সেই নেশা তার জীবনকেও গ্রাস করছে। তাসের মাধ্যমে রেখার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পায়। পরস্ত্রীর সৌন্দর্যের প্রতি আসক্ত হয় –

> "এই মার্জিত দীপ্ত মেয়েটির পাশে অমূল্য যেন অনেকখানি স্থুল, কেমন যেন বেমানান। আর রেখাও বলে, নমিতা কেমন মোটা হয়ে যাচ্ছে দেখেছেন? ...পড়ে পড়ে ঘুমাবে আর বাংলা সিনেমা দেখবে, এছাড়া তো কাজকর্ম কিছু নেই। ...কিছুদিন পড়ে দেখবেন তেলের কুপোর মতো গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটছে।"[৮]

অমূল্যের অনুপস্থিতিতে রেখা অসিতকে বাইরে বেড়ানোর প্রস্তাব দেয়। পথের মাঝে সে প্রকাশ করে স্বামীর উদাসীনতা এবং কর্মব্যস্ততার কথা। প্রকৃতির সান্নিধ্যে রেখার কোমল শরীর অসিতের কাছে অপার্থিব সৌন্দর্যের আধার বলে মনে হয়। ঝরনার ধারে একটি প্রস্তরখন্ডের উপর বসে তারা পরস্পরের অনেকটা ঘনিষ্ট হয়। অকস্মাৎ রেখা শিউরে ওঠে। উভয়ে এতটাই কাছাকাছি চলে আসে যে, অসিতের ঠান্ডা নিঃশ্বাস লাগে তার দেহে। নতুন উপলব্ধিতে দুজন নিঃশব্দে বাড়ি ফেরে। এসময় তাসের প্যাকেট দুটি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। গল্পের শেষটি এরকম –

> "দু প্যাকেট তাস পুড়তে সময় লাগে। সেইসঙ্গে বুকের ভেতরটাও ধিকিধিকি করে পুড়ছে রেখার। ঝাপসা চোখে তাকিয়ে দেখছে, প্রত্যেকখানা তাস কী অদ্ভত ভাবে বেকে বেকে পুড়ে যাচ্ছে – মনে হচ্ছে অসংখ্য কিউটে সাপের ফনা।"[৯]

তাসগুলো যেন কেউটে সাপের প্রতীকী হয়ে উঠেছে, যেগুলো অবিরাম বিষ উদ্গীরণ করছে, দংশন করতে চাইছে তাদের দাম্পত্য সুখ, তছনছ করে দিচ্ছে পরিবার জীবন। রেখা তাই প্রত্যাবর্তন করেছে নির্ঝঞ্ঝাট দাম্পত্য জীবনে। এ

গল্পে অসিত রেখার জীবনের ধারা উল্টে যাবার সুযোগ ছিল এবং সেই ধরনেরই পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু লেখক তাঁর ইতিচেতনার কারণে তাদের বিকৃত প্রায় জীবনাচার থেকে ফিরিয়ে এনেছেন সুস্থ জীবনে।

'লজ্জা' গল্পে ফিলজফিতে এম.এ শান্ত আত্মভোলা মেধাবী ছাত্র বিনয় দুর্গেশবাবুর মেয়ে উজ্জ্বলাকে পড়াত। পড়াশোনার গন্ডীর বাইরে কখনো বেড়িয়ে না এলেও দুর্গেশবাবু এবং বিনয়ের মা উজ্জ্বলার সাথে তার বিয়ে দেবেন বলে স্থির করেন। বিয়ের দিন এগিয়ে এলে, বিনয় এই খবর জেনে কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হয় না। এদিকে পাড়ার ছেলেরা মিলে কৌশলে এক বৃদ্ধ বর সাজিয়ে পথে সাজানো বরের গাড়ি আটকে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত বিনয় এই বিয়েতে সম্মত হয়। কিন্তু বিনয় রাজি হলেও মানসিক দ্বন্দ্ব জর্জরিত উজ্জ্বলা ছলনা করে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে, হীন চক্রান্তের মধ্য দিয়ে বিয়ের সাথে তার জীবন জড়িয়ে নিতে চাইল না।

> "মুহূর্তে মরে গেল উজ্জ্বলা। শেষ পর্যন্ত এইভাবেই তাকে পেতে হল বিনয়কে? এমনি ছলনা দিয়ে, এমনি মিথ্যার ভেতরে? সকলে মিলে একটা হীন চক্রান্ত করে তাকে জড়িয়ে দিলে বিনয়ের জীবনে? এ লজ্জা সে কোথায় রাখবে?"[১০]

এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে সে আত্মহননের পথকে বেছে নেয় –

> "মৃত্যুর শূণ্যতায় নিজেকে ছেয়ে দিয়ে শেষবারে মতো উজ্জ্বলা বললে, ছিঃ- ছিঃ- ছিঃ।"[১১]

'জীবানু' গল্পের ডাক্তার সারদা প্রসাদের জীবনে একদিন রোমান্স ছিল। প্র্যাকটিস, ল্যাবরেটরী আর প্রেমিকা গ্লাডিসকে নিয়ে সারদা প্রসাদ কামনা করেছিলেন একটি পরিপূর্ণ সুখী জীবন। কুমারী গ্লাডিসের চোখে তিনি দেখেছিলেন সমুদ্র পারের নীলিমা, দেহে দেখেছিলেন আল্পসের তুষার আর রক্তে ইউরোপের জাগ্রত যৌবন। কিন্তু –

> "নিজে বেশ বুঝতে পারছিলেন শরীরের মধ্যে এমন একটা কিছু ঘটেছে যা সাধারণ ক্লান্তি নয়, তার চাইতেও আরও বেশি কিছু।"[১২]

সুইজারল্যান্ডে এসে তিনি জানতে পারেন ঘাড়ের নিচে মেরুদন্ডে যখন ধরা পড়ে টিউমার কুলোসিস, তখন সারদা প্রসাদের জীবনের সব স্বপ্ন মুছে যায়। প্র্যাকটিস, ল্যাবরেটরী তার কাছে মিথ্যা হয়ে যায়। ইংলিশ চ্যানেলের নীল জলে রূপসী গ্লাডিসের নীল চোখ যায় ডুবে। অস্ত্রোপচারের পর –

> "সারদা প্রসাদ উঠতে পারেন না। কাঁধ আর গলার মাঝামাঝি অনেকটা জায়গার হাড় একেবারে কেটে বাদ দিতে হয়েছে, উঠে দাড়াতে গেলেই মাথাটা পেছনের দিকে ভেঙ্গে পড়তে চায়। ...ইচ্ছামতো মাথাটা ঘোরাবার উপায় পর্যন্ত নেই – বিছানায় একই ভাবে চিত হয়ে পড়ে থাকাই হচ্ছে তার দৈনন্দিন জীবন। মুখের সামনে স্প্রীংয়ের আয়না ফিট করা রয়েছে, চারিদিকে দৃশ্য দেখবার জন্যে আয়নাটাকে তিনি যেদিক ইচ্ছা ঘোরাতে পারেন। সাদা চোখে সহজ ভাবে জগৎকে দেখবার অধিকার থেকে তিনি বঞ্চিত।"[১৩]

ব্যর্থ পঙ্গুজীবনে সারদা প্রসাদ পত্র-পত্রিকা এলেই খোঁজেন এমন এই বৈজ্ঞানিক তথ্য যা তার ঘাড়ের কাটা হাড়কে নতুন করে জোড়া লাগাতে পারে। জীবনে তিনি চেয়েছিলেন সূর্যালোক প্রদীপ্ত উজ্জ্বল একটি পরিপূর্ণ বাঁচাকে। আঘাত – ব্যাথা – দুঃখ- কষ্ট- যন্ত্রনা – গ্লানির মধ্য দিয়ে কামনা করেছিলেন সমস্ত কিছুর ঊর্ধে যে জীবন সত্তা, তাকেই। তা যখন হল না, তখন তিনি বৃষ্টি, কুয়াশা, বরফগলা শীতল ঝর্না আর পাইন- দেওদারের মর্মরতা নিয়ে পাহাড়ী প্রকৃতির উন্মত্ত উদার প্রেমের মধ্যে তিনি আশ্রয় খুঁজেছেন। তিনি কোনকালে ঈশ্বর মানেননি এমনকি প্রতিকুল পরিস্থিতিতেও না।

> "বস্তুবাদী হিসাবে তিনি জানেন, ঈশ্বর – কল্পনা মানুষের অজ্ঞান অবুদ্ধির পরিণাম, জন্মান্তরবাদ আষাঢ়ে গল্পের চাইতে একটু বেশি মুখরোচক মাত্র। তবু সারদা প্রসাদের আর্তনাদ করে উঠতে ইচ্ছা করে, ...যদি ঈশ্বর নামের কেউ থাকো, তবে হে ঈশ্বর, বিচার করো, উদ্ধার করো আমাকে, আমার জীবন আমাকে ফিরিয়ে দাও।"[১৪]

তাই নিজের পঙ্গুত্বময় জীবনে আশ্রয় না পেয়ে তাঁর বাংলোর বারান্দায় যৌবনোজ্জ্বল স্বাস্থ্যবান পাহাড়ী দম্পতির উপস্থিতি তাঁর অন্তরের সুপ্ত বাসনাকে জাগ্রত করে। যৌবনে ব্যর্থ পরাজিত সারদা প্রসাদ পাহাড়ী দম্পতিকে তাড়িয়ে দিয়েও শান্তি পাননি। তাদের দাঁড়াবার জায়গায় ফিনাইল, লাইজোল স্প্রে করে জীবানুমক্ত করতে চাকরকে বললেন। আসলে –

> "সারদা প্রসাদ বাঁচতে চান। কিন্তু সত্যিই কাকে ভয় করেন তিনি? ওদের জামাকাপড়ের ব্যাকটেরিয়াকে, না ওদের পাথুরে শরীরের শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে প্রবাহমান যৌবনকে? জীবনকে, না জীবানুকে?"[১৫]

তিনি ভয় করেন জীবানুকে, ভয় করেন মৃত্যুকে।

"বনতুলসী' একটি রোমান্টিক গল্প। এই গল্পের নায়ক রঞ্জনের জীবনে প্রথম নায়িকা তুরী মেয়ের বেশে এসে দেখা দিয়েছিল বনতুলসীর বনে। বনতুলসীর বনে এই মানবিক প্রেমে আবির্ভাব বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে অপরুপ বর্ননা, মাঠ- ঘাট, আবারিত দিগন্ত, ধানের ক্ষেত, বনতুলশীর ঝাড়, শরতের সোনা ঝড়ানো আকাশ, মরা নদী, টেলিগ্রামের তারে ফিঙে আর বুনো টিয়ার নাচ, কাশ ফুলের সমরোহ, রঙ বেঙের প্রজাপতি সব মিলে গল্পের পরিবেশ রোমান্টিক হয়ে উঠেছে–

> "আমার প্রথম নায়িকা দেখা দিয়ে সেই যে হারিয়া গেল, তারপর আর কোনোদিন সে ফিরে আসেনি।"[১৬]

বন্ধুদের সাথে শিকারের সন্ধানে নায়ক বেড়িয়ে পড়েছিল, যেখানে লেখক বনতুলসীর সন্ধানে ছিল ব্যাপৃত–

> "আকাশে ছাড়িয়ে গেল সাতরঙের বিচিত্র কিরণরেখা। হাসের ডিমের মতো চ্যাপ্টা একটা বিরাট রক্তের ছোপ বিলের জল আর সবুজ বনান্তকে মায়াময় করে তুলল। সেই সূর্যোদয় আমি কখনো ভুলতে পারব না - সেই সূর্যের আলোয় বন তুলসীর গন্ধ ছিল।"[১৭]

প্রকৃতির মাঝে লেখক আবিষ্কার করে বনতুলসী রূপ পূর্ণযৌবন সাঁওতাল মেয়েকে। সর্বগ্রাসী প্রেম নায়কের সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফলে বনতুলসীর ডাঁটা-পাতার স্পর্শ ও কটু গন্ধর ভেতরে আদিমতার আস্বাদন লাভ করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেও তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে নায়ক নিষ্কৃতি পায়নি –

> "জ্ঞানটা সম্পূর্ণ লোপ হয়ে যাওয়ার আগে মনে হল, এইখানে মরে যাব আমি, পচে গলে আমার দেহটা এখানকার মাটিতে মিশে যাবে। তারপর আমার শরীরের সারে এখানে মাথা তুলবে আরো সতেজ, আরো নিষ্টুর, আরো একরাশ বন- তুলসী, নিশ্চিহ্ন করে ওরা আমাকে গ্রাস করবে, আত্মসাৎ করে নেবে-।"[১৮]

বন্ধুরা এসে তাকে রক্ষা না করলে প্রকৃতি নায়িকার এই ঊর্ণনাভ প্রেম থেকে সে কিছুতেই রক্ষা পেতো না। বনতুলসীর বনের অপরূপ বর্ণনা, বনবালিকার আবির্ভাব ও বিদায় এবং প্রকৃতি প্রেমের সর্বগ্রাসী রূপ আশ্চর্য রোমান্টিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে গল্পে তুলে ধরা হয়েছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হরিনের রঙ' গল্পে পাওয়া যায় প্রীতিস্নিগ্ধ পারিবারিক আবহ। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনিলের স্ত্রী। যক্ষারোগে আক্রান্ত এ নারীকে রাখা হয় শালবন পরিবেষ্টিত একটি বাংলোতে। স্ত্রীর অন্তিম দিনগুলো শান্তিতে অতিবাহিত করবার সকল বন্দোবস্ত করেছে অনিল। তার বোন নন্দাও সর্বদা বৌদির সেবায় নিয়োজিত থাকে। সকালে ধূপকাঠি জ্বালানোর সময় নন্দার কাছে বৌদি বারান্দায় যাওয়ার আবদার করে এবং বলে –

> "আমি মরব না, দু দিনের ধাক্কা যখন সামলে উঠেছি – আর মরব না। দেখিস, এক মাসের মধ্যেই আবার আগেকার শরীর ফিরে পাব আমি আবার ব্যাডমিন্টন খেলব তোদের সঙ্গে। তোর দাদার জন্যেই দুঃখ হচ্ছে আমার। দিব্যি আর একটা বিয়ে করার চান্স পাচ্ছিলেন – একটুর জন্য ফস্কে গেল।"[১৯]

পৃথিবীর সব কিছু উপভোগ করতে চায় অনিলের স্ত্রী। কলকাতায় ফিরে যাওয়ার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। স্বামীর সাথে কেনা কাটা করতে চায়, সাংসারিক খুনসুটি নিয়ে মগ্ন থাকতে চায়। স্নেহের দুই পুত্রের জন্য ভাবনার শেষ নেই। নন্দার চেহারার মধ্যে সে প্রত্যক্ষ করে নিজের যুবতী বয়সের রূপশ্রী। নন্দা রজতের সম্পর্কের মাঝে সে অনুভব করে প্রথম প্রেমের স্পন্দন। ননদের আসন্ন বিয়ের সানাই সে উপভোগ করে কল্পনায়। বৌদির অসংলগ্ন আচরনের প্রেক্ষিতে নন্দা দাদাকে সতর্ক করে –

> "টিবির লাস্ট স্টেজে ওটা জীবনের আশ্রয় অনিলদা রাতটাও বোধ হয় কাটবে না।"[২০]

সংসারের প্রতি মানুষের সুতীব্র আকাক্ষা – লেখক মৃত্যুপথযাত্রী নারীর দৃষ্টিকোন থেকে উপস্থাপন করেছেন।

'হয়তো' গল্পটি সুদেব ও মঞ্জশ্রীর বিবাহ ও বিবাহ পরবর্তী বিচ্ছেদের গল্প। ভালোবেসে বিয়ে করলেও দুজনের ব্যবধানের কারণে অল্পদিনে তাদের সংসারে ভাঙন ধরে। পরিনাম স্বরূপ মঞ্জ 'নার্ভাস ব্রেক ডাউনে' আক্রান্ত হয় এবং সুদেব আত্মহত্যার ভাবনায় ভাবিত হয়। সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তারা আইনের শরনাপন্ন হয়। বিচ্ছেদের ছাড়পত্র নিয়ে তারা আদালত প্রাঙ্গন ত্যাগ করে।

প্রায় ছয় বছর পর চলন্ত ট্রেনে প্রাক্তন এই দম্পতির সাক্ষাৎ হয়। ডিভোর্সের পরও মঞ্জশ্রীর কপালে শোভা পায় সিদুরের মস্ত ফোটা। সুদের বোঝে, মঞ্জশ্রীর বিশ্বাস ও সংস্কারকে। আদালতে সম্পর্কের ইতি ঘটলেও, তার কাছে এ বিয়ে জন্ম – জন্মান্তরের বন্ধন। অসুস্থ পিতার জন্য মঞ্জ তারকেশ্বরে পুজো দিতে এসেছিল। তবে শুধু বাবা নয়, স্বামীর জন্যও সে দেবতার কাছে কল্যান প্রার্থনা করেছে। শ্যাওড়াফুলিতে ট্রেন থামলে মঞ্জ নেমে পড়ে। কারণ, এ অঞ্চলেই সে চাকরি করে। তার বিদায়ে সুদেব মানসিক যন্ত্রনা অনুভব করে স্ত্রীকে বলতে তার ইচ্ছা করে –

> "তুমি বিয়ে কতে পারোনি আমিও না- হয়তো, হয়তো ছ বছর আগের সাপটা মরে গেছে এতদিনে, হয়তো আজ আমরা দুজনে মিলে সেই ভুলের মূলটাকে খুজে বের করতে পারি।"[২১]

সমাজ সংস্কার ভুলে দুজনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও তারা সুখী হয়নি। তবে বিচ্ছেদের পর তারা স্বকীয়তা ও আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে পেরেছে। মিলনের সম্ভাবনা তৈরী হলেও মঞ্জ পূর্ববর্তী অবস্থানে প্রত্যাবর্তন করতে চায়নি। মূলত নারী–পুরুষের মনস্তত্ব সম্বন্ধে সুদের মঞ্জশ্রীর দৃষ্টিভঙ্গী বরাবরই পৃথক। তাদের উক্তিই তার সাক্ষর বহন করে চলেছে।

> "সুদেব : মিথ্যেটা পুরুষের উপর দিয়ে যাওয়াটাই ভালো, মঞ্জ। তারা টেরিলিলনের জামার মতো ওয়াশ অ্যান্ড উইয়ার। কিন্তু মেয়েদের নিন্দের রঙটা পাকা – সত্য – মিথ্যের যাচাই সেখানে অবান্তর।"[২২]

মঞ্জশ্রী :

> ক) ''অভ্যেস বদলাতে মেয়েদের সময় লাগে। আরো যদি সেটা সংস্কারের সঙ্গে জড়িয়ে যায়।''[২৩]
> খ) "কপালের সিঁদুর নিয়ে বাঙালী মেয়েরা ঠাট্টা করে না।''[২৪]

জীবনের সব তিক্ততা ও গ্লানির ভেতরে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিজাড়িত সুদেবের কাছে শুভ মুহূর্তটি প্রস্ফটিত পদ্মর মতে হয়ে রইল, উভয়ের মিলন আর সম্ভব হল না। মিলনের পরিবেশ তৈরী হয়েও সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। এই গল্প তাই রোমান্টিক।

"হাঁস" গল্পে জলসা গ্রামের প্রকৃতি যথা – আদি – দিগন্ত মাঠ, নির্বাধ আকাশ, প্রাগৈতিহাসিক অশ্বত্থবটের জড়াজড়ি, সাদা আকাশের সীমান্তে ফুটন্ত পদ্মকলির মতো প্রথম সূর্য অপরুপ প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে গল্পে রোমান্টিক উপাদান বহন করে এনেছে। প্রকৃতির মাঝে বুনো হাসের রূপের মধ্যে আছে অর্পূবত্বের ব্যঞ্জনা। কিন্তু বীরেশ্বর প্রকৃতির সান্নিধ্য নয় বরং হাস শিকারের লক্ষ্যে উপস্থিত হয়েছে জলসা গ্রামে।

> "মাপ করতে হবে ভাই, ওসব কাব্য নেই আমার মগজে। আমি স্রেফ বস্তুতান্ত্রিক।"[২৫]

তাইতো বীরেশ্বর চীনে হাঁস শিকার করেও লালসার শিকারের উদ্দাম নেশা যেন তারই জীবনে অবলীলাক্রমে মণীষা মিত্র, শোভনা চক্রবর্তী, সুরমা রায়কে পেছনে ফেলে দেয়। রজতের কথায় –

> "এ এক অদ্ভত খেলা বীরেশ্বরের, অমানুষিক আনন্দ। হাতের মুঠোয় দিনকতক নাচিয়ে ছুয়ে দেওয়া কেওড়া পথের কাদার মধ্যে। আবার নতুন পুতুলের পালা পরে।"[২৬]

জলসার আশ্চর্য রোমান্টিক পরিবেশে হাঁস আর নায়িকা মঞ্জ দত্ত একাকার হয়ে গেছে। মঞ্জ দত্তকে পাওয়ার আকাঙ্খা লালশর হাঁসের শিকারের সমতুল প্রতীকি হয়ে দাঁড়িয়েছে -

> "মঞ্জ দত্ত ও লালশরের মতো বেগ দিচ্ছে তাকে, পিছলে পিছলে যাচ্ছে হাতের মুঠো থেকে।"[২৭]

কিন্তু শেষপর্যন্ত লালশর হাঁসের শিকার করতে পারেনি বীরেশ্বর। ঘাসবনের মধ্যে পথ হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে -

> "ঘাসবনের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা বীরেশ্বরের দেহটাকে ঘিরে সারারাত নাচতে থাকল আলেয়া - হাঁসের ডাক প্রহরের পর প্রহর ধরে প্রেত অন্ধকারটাকে মুখর করে রাখল মঞ্জ দত্তের উচ্ছ্বলিত হাসির মতো।"[২৮]

নারী পুরুষের সাংসারিক জীবনের মূল ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস ও নির্ভরতা – এমন বক্তব্যের প্রতিচ্ছবি পাই 'কান্ডারী' গল্পে। মধ্যবয়সী অখিল ঘোষের সঙ্গে বিয়ে হয় যুবতী অলকার। শুধু বয়সের তারতম্য নয়, দহিক গঠন এবং চারিত্রিক আচরণেও তাদের ব্যবধান ছিল বিস্তর। তাদের দাম্পত্য জীবন কোনদিনই সুখকর হয়নি। অখিল ঘোষ কোনদিন তার স্ত্রীর কাছ থেকে ভালোবাসা পায়নি। তার নিগ্রোর মতো গায়ের রঙ, চ্যাপটা ঠোট, সাদা মার্বেলের মতো ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ হয়তো অলকার ভালো লাগেনি। অখিল ভালো ফুটবল একদিন খেললেও বর্তমানে তার শরীরে

চর্বি জমেছে। চেহারা হয়েছে ফুটবলের মতো গোল। আই. এ ক্লাসে সে তিনবার ফেল করেছে। এবং সপ্তাহে অন্তত তিনদিন সে ক্লাব থেকে মাতাল হয়ে ফেরে। শুভদৃষ্টির সময় তাকে দেখেই অলকা আতঙ্কে চোখ বুজে এবং ফুলশয্যার রাতে এক টুকরো কাঠের ভেতরে প্রানসঞ্চার করতে ব্যর্থ প্রয়াস করেছিল অখিল ঘোষ। টাকা, কাঠের ব্যবসা, চায়ের ব্রোকারি, বাড়ি, গাড়ি সব থাকা সত্ত্বেও অলকার মনকে এসব দিয়ে সে ভরিয়ে দিতে পারেনি। এমনকি চার হাজার টাকার হীরের আঙটি দিয়েও সে অলকাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। সে বুঝেছে –

> "টাকা দিয়ে পেশাদারী প্রেম কিনতে পাওয়া যায়, হয়তো কুরূপ কুশ্রীতা সত্ত্বেও সুন্দরী পরস্ত্রীর অনুগ্রহদৃষ্টি লাভ করে চলে, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে জয় করা যায়না।"[২৯]

অখিলের বাড়িতে থাকে তারই জ্ঞাতি ভাই প্রতাপ। অখিলের কাঠের কারখানা পরিচালনা করে সে। মিষ্টি গানের গলা আর ভালো টেনিস খেলোয়ার প্রতাপের সুশ্রী চেহারা আর বয়স ত্রিশ বছর হলেও অলকা তাকে দেবর হিসাবেই দেখেছে। দাম্পত্যজীবনে স্বামীর সঙ্গে দূরত্ব সত্ত্বেও অলকা প্রতাপকে এড়িয়ে চলে। অখিলের মনোযন্ত্রনা সেখানেই –

> "সন্দেহ করতে পারলে আত্মদহন ছিল, আত্মতৃপ্তি ছিল সেই সঙ্গে। একটা তুচ্ছতম উপলক্ষ পেলেও নিজেকে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে সে প্রকাশ করতে পারত, এক মুহূর্তে অলকার কাছে প্রমান করতে পারত - আর কিছু না থাকলেও তার একটা পৌরুষ আছে, যা আদিম, যা অবিশ্বাস্য রকমের নিষ্ঠুর।"[৩০]

একদিন অলকা ও প্রতাপকে নিয়ে অখিল জিপ যোগে বেড়াতে যায় । পাহাড়ি রাস্তায় একটু অসাবধানতার কারণে ঘটতে পারে অবধারিত মৃত্যু। দীর্ঘদিনের ড্রাইভিংয়ের অভিজ্ঞতা থাকলেও অখিল একদিন 'পৃথিবীর সমাপ্তি' ঘটাতে চায়। মধ্যরাস্তায় গাড়ি চালানোর দায়িত্ব নেয় প্রতাপ। কিছুক্ষন পর প্রচন্ড ঝাঁকুনিতে জিপটি ডানদিকের পাহাড়ে আটকে যায়। এমন পরিস্থিতিতে স্বামীকে অলকা বলে –

> "তখনই বলেছিলুম, ও আনাড়ীর হাতে গাড়ি দিয়োনা! খালি টেনিস খেলতে পারলে আর গান গাইলেই কি সব পারা যায় সংসারে?"[৩১]

অখিলের কালো হাতটি ধরে সে জানায় –

> "তুমি ছাড়া কাউকে আমার ভরসা নেই – কারুকে বিশ্বাস নেই। তুমিই গাড়ি চালাও, তোমার হাতে স্টিয়ারিং থাকলে কোন পথকেই আমার ভয় করে না।"[৩২]

সংসার যাত্রার আড়াই বছর পর অখিল নিজের অজান্তে হয়ে যায় স্ত্রীর সত্যিকারের কান্ডারী। এ প্রসঙ্গে সমালোচক অরুন কুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য স্মরণযোগ্য –

> "প্রেম কী? অলস মুহুর্তের বিলাস, না, নিরাপত্তা ও জীবনের সুদৃঢ় আশ্রয়? এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পাঠককে সচকিত করে তোলেন।"[৩৩]

যে কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার নামই সংসার ধর্ম – 'প্রতিপক্ষ' গল্পে বোঝানো হয়েছে। এ গল্পের প্রধান চরিত্র ইন্দুভূষন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে সে রেডিওতে গান করে। এরপর তার কয়েকটি রেকর্ড বাজারে আসে। রেডিওতে সহশিল্পী শিখার সাথে পরিচয় ও পরবর্তীতে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। শিল্পীসত্ত্বা ছাড়া আর ও কিছু বিষয়ে তাদের সাযুজ্য রয়েছে।

> "দুজনেই কায়েত, দুজনেই মধ্যবিত্ত এবং আরো বড় যোগাযোগ - বহুকাল দেশছাড়া হলেও দুজনেরই আদি বাড়ি বরিশালে। কোন পক্ষ থেকেই আপত্তির কোনো কারণ ঘটল না। বরং সবাই খুশি হয়ে বললেন, রাজযোটক!"[৩৪]

বিয়ের পর ইন্দুভুষণ প্রচুর গানের টিউশানি করে। এছাড় রেকর্ডের রয়্যালিটি, রেডিওর অনুষ্ঠান এবং সিনেমার প্লে-ব্যাক থেকে সে যথেষ্ট আয় করে। স্ত্রী পরামর্শ অনুযায়ী দ্বৈত – সংগীতের প্রস্তাব নিয়ে ইন্দু ভূষন যায় গ্রামোফোন কোম্পানিতে কিন্তু ডুয়েট গানের ক্ষেত্রে কোম্পানি আপত্তি করে। ইন্দুর রেকর্ডে আগ্রহী হলেও, তারা শিখার জন্য বিনিয়োগ করতে চায় না। পরদিন থেকে চলে মেয়েটির সংগীত চর্চা। একজন বড় ওস্তাদের কাছ থেকে সে দু বছর প্রশিক্ষন নেয়। তবে ইন্দু জানে শিখার 'ন্যাক থাকলেও ট্যালেন্ট নেই'। সরস্বতী পূজায় ইন্দুভূষন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান

গায়। কিন্তু কোথাও আমন্ত্রন না পেয়ে শিখা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। এইসব আয়োজনে সে ইন্দুকে তার নাম প্রস্তাব করতে বলে এবং এর অন্যাথা ঘটলে অহেতুক সন্দেহ করে –

> "তুমি তো ইচ্ছা করলেই আমার কথাটাও ওদের বলতে পারতে। ...ওদের হয়তো খেয়াল হয়নি। হয়তো ওরা জানেই না, আমি এ বাড়ীতে থাকি। কিন্তু তুমিই তো সেটা ওদের মনে করিয়ে দিতে পারতে ...তুমিও চাওনা যে লোকে আমাকে জানুক। তুমি ভাবো রেডিও আমাকে নিছক দয়া করে প্রোগ্রাম দেয় আর গানের আসরে আসবেন অমুক দেবী, তমুক শ্রীমতি তাদের মাঝখানে আমাকে নিয়ে গেলে তোমার রসালাপেও তো কিছু অসুবিধা হবে।"[৩৫]

সাংসারিক শান্তি বজায় রাখতে ইন্দুভূষণ আয়োজকদের কাছে স্ত্রীর প্রতিভা তুলে ধরে। যারা বিনাপয়সায় শিল্পী খোঁজে তারা খুশি হলেও, অন্যরা আপত্তি করে। এরপর শুধু গানের আবদার নয়, শিখা সম্মানীও দাবী করে। ইন্দুভূশণ বাধ্য হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে অভিনয় করে, নিজের উপার্জন থেকে সে স্ত্রীকে কখনো ত্রিশ কখনো পঞ্চাশ টাকা দিতে থাকে। সে জানে, অর্থের প্রতি শিখার কোন লোভ নেই, শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি পেলেই সে খুশি। কিন্তু এই নাটকের যবনিকা ঘটে যখন একটি বড় জলসা থেকে ফেরার পথে কিছু তারা শুনতে পায় –

> "পয়সা দিয়ে এইসব শিখা ফিকাকে কেন যে আনে – পাগল – কে পয়সা দিয়েছে শিখাকে? ইন্দুবাবুকে আনতে গেলে ওই এক জ্বালা। কেবল ইনসিস্ট করেন স্ত্রীর জন্যে – বলেন, কিছু দিতে হবে না। শুধু দু – একটা গান।"[৩৬]

এই মন্তব্যে শিখা যেমন ভেঙ্গে পড়ে, অন্যদিকে ইন্দুও তাকে সমবেদনা জানানোর ভাষা হারিয়ে ফেলে। স্বামী – স্ত্রীর সমঅবস্থান যে সংসার জীবনকে বিপর্যস্ত করে– এ উপলব্ধি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছিল। বন্ধু ব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায়কে তিনি বলেন –

> "এই সংসার জীবনই দ্যাখ – এক ছাদের নীচে বিপরীতধর্মী মানসিকতা নিয়ে আত্মসচেতন দুটি মানুষ থাকতে পারেনা। খ্যাতির বিড়ম্বানায় এর থেকে লোকের পরিত্রানের উপায় নেই। তা ছাড়া আমার মনে হয়–ঘরের বৌ, 'বৌ' হয়ে থাকলেই সংসারে শান্তি বজায় থাকে।"[৩৭]

'প্রতিপক্ষ' গল্পে ইন্দুভূষণ সংসার সুরক্ষায় সংগীত ত্যাগ করে। কারণ গানের চেয়ে সে স্ত্রীকে বেশি ভালোবাসে। গান দুজনের মাঝখানে প্রতিপক্ষ হয়ে উঠুক, দজুনকে বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট করে দিক – এটি ইন্দু মানতে পারেনি। তাই হারমোনিয়াম, তানপুরা, তবলা বিক্রি করে সে একটি মনোহারি দোকান দেয়, শিখাও বেছে নেয় শিক্ষকতার পেশা। এভাবে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে এ শিল্পী জুটির দাম্পত্য বন্ধন অটুট থাকে।

ভালোবাসার সম্পর্কের মাঝে অভিমানের শক্ত প্রাচীর থাকলেও, স্নেহ সেখানে নিরঙ্কল – এই সত্য বিভাসিত হয়েছে 'পুরানো' গল্পে। শহরের একজন প্রসিদ্ধ অ্যাডভোকেট সুখময়। দর্শনার্থীদের আইনি সহায়তা প্রদান তিনি গভীর রাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। একদিন সন্তানদের ঠাকুমার কোলে গল্প শুনতে দেখে সুখময়ও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ত্রিশ বছর পর মায়ের হারানো গল্পে তিনি ফিরে পান হারানো শৈশব। ইতিমধ্যে মায়ের শরীরে এসেছে নানা পরিবর্তন। কপালের সিঃদুর, হাতের শাঁখা ত্যাগ করে তিনি বরণ করেছেন বৈধব্য দশা। অথচ তার মধ্যে থেকে গেছে রূপকথার অনন্ত যৌবনা মেয়েটি।

এমনই এক আবেগখন মুহূর্তে সুখময়ের সামনে দাঁড়ায় তার স্ত্রী প্রতিমা। স্বামী – সন্তানদের রেখে সে গিয়েছিল বান্ধবীর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। দামি শাড়ি এবং সুগন্ধির জৌলুস সে প্রদর্শন করে নিজের আভিজাত্যকে। মায়ের পাশে স্বামীর এই শিশু আচরণ তার ভালো লাগেনি। তাই সে বলে বসে –

> "বেশ তো, কাল একটা রূপোর ঝিনুক – বাটি কিনে দেব, মা আবার কোলে করে দুধ খাওয়াবেন। আবার চোখ বড় বড় করে শুনবে পুরানো রূপকথার গল্প এক ঝলক হেসে উঠেই গম্ভীর হয় প্রতিমা] সত্যি কি পাগলামি হচ্ছে বলো তো? আসবার সময় দেখে এলাম সাত – আটজন লোক বসে রয়েছে নিজের ঘরে। আর তুমি এখানে-"[৩৮]

এমনকি ঠাকুমার কাছে সন্তানরা ঘুমালেও, অযত্ন হয়েছে ভেবে প্রতিমা গৃহকর্মীদের তিরস্কার করে। এই ঘটনার পড়ে সুখময়ে প্রচন্ড জ্বর হলেও, ডাক্তার, ইনজেকশন এবং আইস প্যাডেও তার অসুস্থতা সারে না। বৃদ্ধা মাতা উদ্বিগ্নবশত

সন্তানের শরীর সম্পর্কে জানতে চায়। কিন্তু তার উপস্থিতি বা আগ্রহ পুত্রবধূর অসহ্য মনে হয়েছে। বিরক্তির সুরে শাশুড়িকে জানায় –

> "আপনি কেন মিথ্যা ঘুর ঘুর করছেন মা? বুড়ো মানুষ – রাত হয়েছে, শুয়ে পড়ুন। আমি তো আছিই।।"[৩৯]

একসময় সুখময়ের অবস্থার অবনতি হলে, প্রতিমা শাশুড়ির শরণাপন্ন হয়। পুত্রবধু ভেঙে পড়লে, মা তাকে স্বান্তনা দেন। মায়ের হাতের স্পর্শে সুখময় অচেতন অবস্থায়ও সাড়া দেয়। ওদিকে একটানা উত্তেজনা-উৎকণ্ঠায় ক্লান্ত প্রতিমা ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরে সে দেখে –

> "মায়ের কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে সুখময়, একখানা হাত দিয়ে মায়ের কোমড় জড়িয়ে রেখেছে শিশুর মতো – যেন তার ঘুমের ঘোরে মা উঠে পালিয়ে না যান। মা ও ঘুমন্ত, খাটের পেছনে হেলান দিয়ে কখন এলিয়ে গেছেন গভীর ঘুমে, একটুকরো তৃপ্তির হাসি জড়িয়ে আছে তার ঠোটের কোনায়। পুরোনো মায়ের কোলে পুরোনো রূপকথা শুনতে শুনতে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে আট বছরের ছেলেটি। প্রতিমা তাদের ঘুম ভাঙাল না। অনাধিকারীর সংকোচ নিয়ে পা টিপে টিপে সরে এল খাতের পাশ থেকে।"[৪০]

এই গল্পে প্রতিমা নাগরিক অভিরুচির বাইরে, ব্যক্তিগত জীবনবৃত্তের বাইরে কিছু ভাবতে চায়নি। স্বামীর উপর ও সে কেবল অধিকার প্রয়োগ করতে চেয়েছে। মা – ছেলের স্নেহের সম্পর্ক সে বোঝেনি। তবে লেখক এই গল্পের চালিকা শক্তি প্রতিমার কাছে দেননি, মায়ের মর্যাদা তিনি এই গল্পে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কেবল স্বামী স্ত্রী নয়, পুরো পরিবারের মিলিত সমন্বয়ে কিভাবে সুখী জীবনযাপন সম্ভব – তার অপূর্ব নির্দেশনা আছে এই গল্পে।

স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধানতম অন্তরায় হল সন্দেহগ্রস্থতা, 'অমনোনীতা' এমনই একটি গল্প। গল্পে লোকেনের স্ত্রী মনিকা গ্র্যাজুয়েট এবং রূপসী। এমন গুনী স্ত্রী পেয়ে লোকেন নিজেকে ধন্য মনে করে। নববধূর আতিয়েতায় মুগ্ধ হয় লোকেনের বন্ধু সুখেন্দু। বিদায় বেলায় অতিথির মাধ্যমে জানা যায় –মনিকার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল দুলাল চৌধুরীর। দুলাল তাদের এক সহপাঠী। যদিও এই বিবাহের দুলালের সম্মতি ছিলনা। পরে দুলাল চৌধুরী অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। বিয়ের দুই মাসের মধ্যে অবশ্য মনিকার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ লোকেন পায়নি । মনিকা কেবল তার রূপে নয়, স্নেহ- সেবা ও ভালোবাসায় ভরে দিয়েছিল লোকেনকে। সুখেন্দুর তথ্যে লোকেন বিব্রত বোধ করে। তার পর্যবেক্ষনে দুলাল মোটেও 'সুপার ম্যান' নয়। বি এ পাশ করে মামার সুপারিশে একটি ছোট চাকরি পায়। এই তথ্য জেনে লোকেন সবকিছুতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তার অনিন্দ্রা ও ক্ষুধামান্দ শুরু হয়। দুলালের উপর একটা অন্ধ আক্রোশ মিছি মিছি লোকেনকে চিন্তিত করে তোলে। দুলালের মধ্যে সে কোন আর্টিস্টকে খুঁজে পায়নি। লোকেন ভেবেছে, মনিকার মতো সুন্দরী বিদূষী স্ত্রীর কাছে দুলাল বড়ই বেমানান। শেষ পর্যন্ত সত্য ঘটনাটি জানার কৌতুহলে লোকেন মনিকাকে দুলাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। মনিকা তাতে রাগ করেনি। এমনকি দুলালের মৃত্যু সংবাদে কোন উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করেনি। মনিকার মতে–

> "এ অপমান বাঙালী নারীকে তো সইতেই হয়। আমি তো এমন অসাধারণ কিছু নই।"[৪১]

লোকেন বারবার দুলালের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চাইলেও, পারে না । স্ত্রীকে ঘিরে সে নতুন ভাবনায় জড়িয়ে পড়ে। তার মনে হয়, মনিকার জীবনে হয়তো ভয়ানক কোন ইতিহাস আছে – যা কেবল জানত দুলাল চৌধুরী। সত্য উদঘাটনের জন্য সে নিদ্রিত স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে জেরা করে সে। শেষ পর্যন্ত লোকেন বুঝতে পারে তার মানসিক সমস্যা –

> "একটা দুরারোগ্য নিষ্টুর ব্যাধির কীট তার হৃৎপিন্ডে বাসা বেঁধেছে। এরপর থেকে দিনের পর দিন সেই বীজানুরা তাকে তিলে তিলে খেয়ে চলবে, সে আর বাঁচতে পারবে না – তাঁর আর পরিত্রাণ নেই।"[৪২]

এক অজানা শক্তি লোকেনকে দুলাল – মনিকা কেন্দ্রিক ভাবনায় তাড়িত করে। মানসিক বিকারে দ্বগ্ধ লোকেনের কাছে ঘুমন্ত স্ত্রীর নিঃশ্বাস বিষাক্ত মনে হয় –

> "ঘরের ভেতরে কোথায় একটা লুকানো সাপ একটানা ফুঁসে চলেছে– কিন্তু সেটাকে দেখতে পাওয়ার কোন উপায় নেই।"[৪৩]

লোকেন যে ভাবে সন্দেহের জালে জড়িয়ে পড়েছে, তা থেকে তার নিস্তার নেই। দুলাল চৌধুরীর অস্তিত্বের কথা লোকেনের মনে এমন বদ্ধমূল ধারনার সৃষ্টি করেছিল যা কোনদিন তার মন থেকে মুছে যায়নি।

'সেই পাখিটা' গল্পে দাম্পত্য সম্পর্কের সীমাহিন টানাপোড়েন শব্দরূপ পায়। বিবাহ বিচ্ছেদের চার বছর পর সঞ্জীব মুখার্জী তার প্রাক্তন স্ত্রী সুনন্দার গৃহে উপস্থিত হয়। সুনন্দা একটি স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মিস্ট্রেস, দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় নতুন ঠিকানায় সঞ্জীবকে দেখে সে আশ্চর্য হয়। হিমশীতল রাতে সুনন্দার দরজায় সঞ্জীবকে দেখে সে অবাক হয়। সুনন্দার ঘরে শীত থেকে বাঁচতে সঞ্জীব ঘরে দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হলে সুনন্দা আপত্তি জানায়। অতীতে বন্ধ করে তাদের আলাপচারিতা সমাজের দৃষ্টিতে অসঙ্গত ছিলনা। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। অনেকক্ষন মৌনভাবের পর সঞ্জীব তাকে 'নন্দিনী' নামে সম্বোধন করলে সে প্রতিবাদ করে। বিয়ের পর এ নামে স্ত্রীকে ডাকলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে সুনন্দার কাছে এটি আপত্তিকর মনে হয়।

সুনন্দার বিচারে, সঞ্জীব চুড়ান্ত অপরাধী। মফস্বলে চাকরিকালে নীহারিকা নামের এক মেয়েকে বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতো সঞ্জীব। সাময়িক আবেগ ও উত্তেজনায় সে মেয়েটিকে বিয়ে করে। কিন্তু নীহারিকা সব জেনে আত্মহত্যা করে, সুনন্দা তাকে ডিভোর্স দেয় এবং বিচারে সঞ্জীবের জেল হয়। বর্তমানে সে সরকারি চাকরির অযোগ্য, তার শারীরিক অবস্থাও শোচনীয়। বেসরকারী কাজের মাধ্যমে সে পুনরায় নিজের জীবন নতুন করে শুরু করতে চায়। কিন্তু সুনন্দা তা অনুমোদন না করে তুলে ধরে তার অতীতে অপরাধের কথা।

> "তুমি বোধ হয় ভেবেছিলে ট্রেনিং থেকে আর আমি ফিরে আসব না? আর ফিরেও যদি আসি দু পাশে দুই যুগলমূর্তি নিয়ে তুমি সিংহাসনে বসবে? আর রাত্রে দুই মহিষীর একজন তোমার মাথা টিপে দেবে, দু নম্বর পদসেবা করতে থাকবে?"[৪৪]

এত অপমানের পরও সঞ্জীব 'কুকুরের মতো কুন্ডলী পাকিয়ে' বসে থাকে। অসহ্য বিদ্বেষ – বিতৃষ্ণার আড়ালে প্রাক্তন স্বামীর রুগ্ন ও দারিদ্রব্যঞ্জক চেহারায় সুনন্দার হৃদয় কিছুটা নমনীয় হলেও পরক্ষনে সে মিথ্যা অস্ত্রে তাকে জর্জরিত করে -

> "আমার স্বামীর ফেরবার সময় হয়ে গেছে, তিনি কাছেই একটি বাড়িতে তাস খেলতে গেছেন। তার ফিরে আসার আগেই আপনার চলে যাওয়া উচিত।"[৪৫]

এ কথা শুনে সঞ্জীব গৃহত্যাগ করে। স্ত্রীর জীবন তার কারণে নতুন করে জটিল হোক তা সে চায়নি। পাহাড়ি রাস্তায় তুষারচ্ছন্নতা, আকাশ থেকে বর্ষিত হচ্ছে বিরোধ- বিরূপতা ভুলে সুনন্দা অকস্মাৎ তাকে নিবৃত্ত করার জন্য ছুটে ডাকতে থাকে। ততক্ষনে বরফের মধ্যে সঞ্জীব পড়ে, সুনন্দাও বিপুল আর্তনাদে সেদিকে ছুটে যায়।

স্ত্রী থাকা সত্তেও সঞ্জীব দ্বিতীয় বিবাহ ছিল সুনন্দার কাছে অবমাননাকর। এজন্য প্রাক্তন স্বামীর প্রতি সুনন্দার রূঢ় আচরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে স্বামীর আত্ম অনুশোচনাকে বুঝতে সক্ষম হয়েছে।

কেবল দাম্পত্য সমস্যা নয়, বরং তা থেকে উত্তরণের গল্প 'ধস'। এ গল্পে স্বামী – স্ত্রী দুই বিপরীত স্বভাবের চরিত্র। ছাত্রাবাস্থায় কিরণ লেখাকে পছন্দ করলেও, সে ভবতোষকে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য দুজন রেজিস্ট্রি অফিসের শরনাপন্ন হয়। এখানে এসেও জড়তা অতিক্রম করতে পারেনা ভবতোষ। বিয়ের পর কিরন লেখা মানসিক দৃঢ়তার সাক্ষর রাখে। বিয়ের পর ভবতোষ একটি ভালো চাকরি পায়, কিরণলেখাও গার্লস স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রিস পদে যোগ দেয়। বছর তিন পর ভবতোষ চাকরি হারালে সৃষ্টি হয় সংকট। মর্যাদার অভাবে সে নিজেকে বিপন্ন বোধ করে। দৈনন্দিন খরচের জন্য সে স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। পরাশ্রয়ী জীবনযাপনে আত্মদগ্ধ ভবতোষ নার্ভাস ব্রেকডাউনে আক্রান্ত হয়।

ভবতোষের অসুস্থতায় কিরণলেখা কর্তব্যপালনে ত্রুটি করেনি। বাড়ি ভাড়া, সাপ্তাহিক রেশন, ছুটির দিনে উত্তম আহারের বন্দোবস্ত – সব কিছু চলে যথানিয়মে। দুটোর পরিবর্তে সে পাঁচটা টিউশনি করে। জীবনযুদ্ধের এসব খবর ছিল স্বামীর অজানা। ভবতোষের আপত্তি সত্ত্বেও কিরণলেখা তার চিকিৎসা চালিয়ে যায়। ডাক্তার তাকে বায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়। তাই সাধ্যানুযায়ী অর্থসংগ্রহ করে কিরণলেখা স্বামীকে নিয়ে দার্জিলিং যায়।

দার্জিলিং–এ প্রাক্তন সহপাঠি রঞ্জিতের সঙ্গে কিরণলেখার দেখা হয়। সে হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট, অবকাশ কাটাতে সে এখানে এসেছে। একটি রেস্তোরায় দীর্ঘদিন পর উভয়ের আলাপ হয়। কিরণলেখার দৃষ্টিতে রঞ্জিত অনেকটা পালটে গেছে। বাংলা বিভাগের লাজুক ছেলেটির সাথে এখন আর কোন মিল নেই। কলেজ জীবনে কিরণলেখাকে

প্রেমনিবেদন করতে গিয়েও সে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে সে বিলাসী – জীবনে অভ্যস্থ হয়েছে। দুজনে একসাথে টাইগার হিল দেখার সিদ্ধান্ত নেয়, স্থির হয় ভোর চারটেয় হবে তাদের যাত্রা এবং রঞ্জিত তার আগেই গাড়ি নিয়ে আসবে লাডেন লা রোডে।

এমনকি স্বামীকে সে টাইগার হিলে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু ভবতোষ কোনভাবেই উৎসাহিত হয় না। এমনকি রঞ্জিতের সঙ্গে স্ত্রীর গৃহত্যাগের মধ্যে যে কুৎসিত চিন্তা রয়েছে, তা নিয়েও সে উদ্বিগ্ন নয়। স্বামীর নিস্পৃহতা তাকে কষ্ট দেয়। কিরণলেখা রঞ্জিতের জন্য অপেক্ষা করেও বাইরের অন্ধকার পরিবেশে রঞ্জিতকে বিশ্বাস করে না। স্বামীর লেপের ভেতর সে আশ্রয় নেয়। বছর দুই পর ভবতোষ তাকে জড়িয়ে ধরে। দুদিন ইচ্ছে করে সে এড়িয়ে চলে দার্জিলিং–এর পথঘাট, অন্যদিকে ভবতোষের মধ্যে দেখা যায় পরিবর্তন, ব্যাক্তিগত কাজ সে একাই সম্পন্ন করে।
দুদিন পর রঞ্জিত তাদের ঘরে উপস্থিত হয়। বাইরে তখন একটানা বৃষ্টি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পটভূমিতে সে বন্য শক্তির ন্যায় আবির্ভূত হয়। আকস্মিক ভূ-খন্ডে দুলে ওঠে তাদের ঘর। ভূমিধসের আশঙ্কায় রঞ্জিত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও, বেশিদূর যেতে পারেনা। মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় দুদিকের পথরেখা। সহসা ভেসে আসে কিরণলেখার চিৎকার – 'আমাকে তোলো, আমাকে তোলো এখান থেকে। আমি এখনো বেচে আছি।' কিরণলেখার বাচার আকুতিকে অগ্রাহ্য করে নিজে বাঁচতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে রঞ্জিত। অথচ এতদিন যাকে সে মৃত প্রায় ভেবেছিল, সেই ভবতোষ 'দানবীয় শক্তিতে' অপসারণ করে ভগ্নবাড়ির ধ্বংসস্তূপ। ভবতোষের কর্মোদ্যোম দেখে রঞ্জিত লজ্জা পায় ও আত্মগোপন করে। তার মনে হয় –

> "একটা আকস্মিক আবেগ নয়। একটা উন্মাত্ততা নয়, এ শক্তির মধ্যে অনেক প্রতীক্ষা, অনেক সংযম, অনেক নিঃশব্দ প্রস্তুতি। তার মৃত্যু হয়নি শুধু আত্মপ্রকাশের জন্য একটা উপলক্ষ্যের প্রয়োজন ছিল। জড়তা ছিল কঠিন – তাই তার আবরণ ভাঙাবার জন্য প্রয়োজন হল এমন এক ভয়াবহ চরম মুহুর্তের।"[৪৬]

কেবল ভবতোষ নয়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের অধিকাংশ পুরুষ 'কুকড়ে থাকা চরিত্র' – কোন না কোন চাপের শিকার তারা। এবং আকস্মিক কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে তাদের জাগরণ ঘটে। গল্পগুলি গতানুগতিক জীবনযাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলেই মনে হয়।

শুধু নর-নারী প্রেম নয়, তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের রূপায়ণে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বাস্তববাদী। অবক্ষয় সমাজে দাম্পত্যজীবনও সে সমস্যা সঙ্কল হয়ে ওঠে তিনি তার গল্পে প্রদর্শন করেছেন। দাম্পত্য জীবনের সুতীক্ষন বিশ্লেষন করতে গিয়ে লেখক রোমান্টিক বর্জিত, ভাবানুতামক্ত, নির্মোহ দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এখানেই তিনি আধুনিকতার দাবি রাখেন। সাংসারিক পরিমন্ডলে সন্দেহ, অবিশ্বাস, কলহ, অর্থলিপ্সা দুটি মানব প্রানকে কিভাবে নিঃশেষিত করে লেখক তা যুক্তি সংগত ভাবে উপস্থাপন করেছেন। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন–

> "বিগত যুগে ফুয়েড প্রদর্শিত মহঃসমীক্ষনের পন্থায় সাহিত্যে জীবন রহস্য উন্মোচনের রীতি অতি প্রয়োগে যেন নিজেকে নিঃশেষিত করেছে। তাছাড়া চেতন- অবচেতনের চিরন্তন সংঘাতের অতলান্ত গভীরতায় ব্যক্তি জীবনের আনন্দ বেদনায় উৎস সাধনের ফলে শিল্পলোকের এক রহস্য মহলের দ্বার উদঘাটিত হয়েছে বটে, ...এযুগের দৃষ্টি ব্যাক্তি কেন্দ্রিকতার গন্ডী অতিক্রম করে সমষ্টি জীবনের বিপুল হৃৎস্পন্দনের ক্ষেত্রে প্রসারিত। এ যুগের শিল্পেও ব্যক্তিনিষ্ঠ মনস্তত্ত্বের স্থান দখল করেছে এক অভিনব মানসলীলা তার নাম দেওয়া যেতে পারে 'সমাজতাত্ত্বিক মনস্তত্ব'। এ যুগের শিল্পী তাই মনের মধ্যে তলিয়ে গিয়েও অন্তর্মূখী নয়, বহির্মূখী। যে সমাজ চৈতন্যে যুগজীবন আন্দোলিত, ব্যক্তি মনের গভীরেও তারই প্রতিফলন।"[৪৭]

লেখকের গল্পে প্রেম ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের পরিস্ফটন অনবদ্য রূপে ধরা পড়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধ, অগ্রন্থিত রচনা, পৃ. ৩৩
২. অধ্যাপক ভট্টাচার্য, জগদীশ রচিত ভূমিকা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, পৌষ ১৩৯৩, সপ্তম মুদ্রণ, প্রকাশ ভবন, পৃ. ১৯

৩. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ।গল্প সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, ৭৩, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪১৬, পৃ ৩৯৮
৪. তদেব পৃ. ৩৯৯
৫. তদেব, পৃ. ৯০২
৬. তদেব, পৃ. ৯০৩
৭. তদেব, পৃ. ৬২৯
৮. তদেব, পৃ. ৬২৯
৯. তদেব, পৃ. ৬৩১
১০. তদেব, পৃ. ৬৩৬
১১. তদেব, পৃ. ৬৩৬
১২. তদেব, পৃ. ২৯৯
১৩. তদেব, পৃ. ৩০০
১৪. তদেব, পৃ. ৩০১
১৫. তদেব, পৃ. ৩০২
১৬. তদেব, পৃ. ২৯৪
১৭. তদেব, পৃ. ২৯৫
১৮. তদেব, পৃ. ২৯৭
১৯. তদেব, পৃ. ৬৪৪
২০. তদেব, পৃ. ৬৪৫
২১. তদেব, পৃ. ৬৪৫
২২. তদেব, পৃ. ৫১০
২৩. তদেব, পৃ. ৫০৯
২৪. তদেব, পৃ. ৫১২
২৫. তদেব, পৃ. ৮৬৫
২৬. তদেব, পৃ. ৮৬৭
২৭. তদেব, পৃ. ৮৭১
২৮. তদেব, পৃ. ৮৭২
২৯. তদেব, পৃ. ১৭৫
৩০. তদেব, পৃ. ১৭৬
৩১. তদেব, পৃ. ১৭৯
৩২. তদেব, পৃ. ১৭৯
৩৩. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, 'কালের পুত্তলিকা', প্রবন্ধ, পৃ. ৩৮৯
৩৪. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ।গল্প সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা -৭৩, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪১৬, পৃ. ১৬৫
৩৫. তদেব, পৃ. ১৬৭
৩৬. তদেব, পৃ. ১৬৮
৩৭. দত্ত, সরোজ, উদ্ধৃতঃ কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১৬৩
৩৮. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ।গল্প সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪১৬, পৃ. ৮৭৫

৩৯. তদেব, পৃ. ৮৭৬

৪০. তদেব, পৃ. ৮৭৬

৪১. তদেব, পৃ. ১৯৪

৪২. তদেব, পৃ. ১৯৫

৪৩. তদেব, পৃ. ১৯৫

৪৪. তদেব, পৃ. ৪০৯

৪৫. তদেব, পৃ. ৪১৪

৪৬. তদেব, পৃ. ৬১৬

৪৭. অধ্যাপক ভট্টাচার্য, জগদীশ রচিত ভূমিকা : গঙ্গোপাধ্যায়ের, নারায়ণ, শ্রেষ্ঠ গল্প : পৌষ ১৩৯৩, সপ্তম মুদ্রণ, প্রকাশ ভবন, পৃ. ১১